ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-১০

মনোবিজ্ঞান

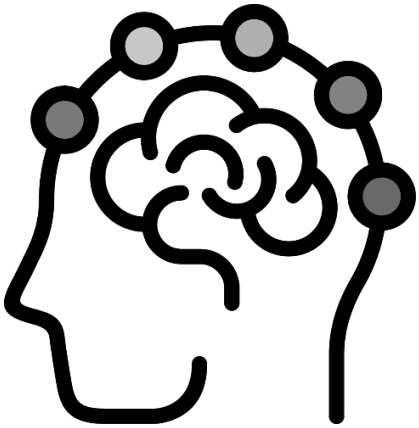

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-১০

মনোবিজ্ঞান

সম্পাদনা ও সংকলন
সমীর কান্তি নাথ
জয়দীপ দে

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা-১০
মনোবিজ্ঞান
সম্পাদনা ও সংকলন : সমীর কান্তি নাথ ও জয়দীপ দে

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক ও সম্পাদকদ্বয়

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

MonoBiggan edited by Samir Kanti Nath & Joydip Dey Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 Second Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bkash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-95631-5-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

রাজা রামমোহন রায়

ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রদূত

ধ্রুপদী বিজ্ঞান প্রবন্ধমালা

১. উদ্ভিদবিজ্ঞান
২. প্রাচীন পৃথিবী
৩. মহাবিশ্ব
৪. মানবদেহ
৫. গণিত
৬. প্রাণিবিজ্ঞান
৭. মানববিজ্ঞান
৮. পৃথিবীর কথা
৯. ভৌতবিজ্ঞান
১০. মনোবিজ্ঞান

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
মানুষের মগজ ১১
মনঃসমীক্ষণের গোড়ার কথা ২২
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি ৩৭
অপরাধ ও অপরাধী ৪৫
আক্রোশ-বিদ্বেষ-ঘৃণা ৫৫
পড়ালেখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ৬৩
মিথ্যা বলার মনস্তত্ত্ব ৬৯
পেশা নির্ধারণে মনোবিদ্যা ৭৬
প্রাণীদের বর্ণ অনুভূতি ৭৯
মনোবিদের চোখে শিশুদের আঁকা ছবি ৮৩
মনোবিদ্যা ও তার ব্যবহার ৮৯

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অগ্রদূত ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তিনি বলতেন, *যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না, তারা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।*

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা উৎসাহিত করার লক্ষে ১৯৪৮ সালে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই পরিষদের পক্ষ থেকে সে বছরই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম সম্পাদক হিসেবে প্রকাশিত হলেও এর নেপথ্যে ছিলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কলকাতার আপার সার্কুলার রোডের বসু বিজ্ঞান মন্দির থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটি তখন দুই বাংলায় দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখনও পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। এ পত্রিকায় বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিষয়বস্তুগুলো রুচিশীল ভাষা ও সাবলীল বর্ণনায় উপস্থাপন করা হতো। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাঙালি কিশোর-তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা বিনির্মাণে এই পত্রিকার ভূমিকা অনন্য। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর পুরনো সংখ্যাগুলো ঘেঁটে ধ্রুপদী কিছু বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ একত্রিত করা হয়। সেসব প্রবন্ধ সিরিজ আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এবারের প্রবন্ধমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত ১১টি প্রবন্ধ। এর আগে বলে নেয়া দরকার কেন এমন একটি কাজে হাত দেয়া। বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। মোবাইলফোন বলতে গেলে সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি এখন নতুন প্রজন্মের কাছে শিশুকাল থেকে সহজলভ্য। এর বাইরে আছে নানা ধরনের ভিডিও গেম।

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলার জন্য মৌলিক বিজ্ঞানবিষয়ক পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে সহজবোধ্য মৌলিক বিজ্ঞানের বইয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে। আবার যে বইগুলো সচরাচর পাওয়া যায় তার বর্ণনা ও উপস্থাপনা উপভোগ্য নয়। এ কারণে বর্তমান প্রজন্মের শিশু-কিশোররা সেসব বই পড়ায় আগ্রহী হয় না। কিন্তু শিশু-কিশোরদের মনের মাঝে প্রকৃতির নানা বিষয়ের প্রতি জানার সহজাত আগ্রহ রয়েছে। এ আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে সহজেই বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন করা যায়।

এ পর্বে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিশু-কিশোররা মনোজগতের নানা বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন প্রথম প্রবন্ধেই আছে মানুষের মগজ বা মস্তিষ্ক নিয়ে আলোচনা। এরপর মনঃসমীক্ষণবিষয়ক প্রবন্ধে মনোজগৎ নিয়ে ফ্রয়েডের ধারণাগুলো সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরের প্রবন্ধগুলোতে মানুষের বিভিন্ন আচরণের নেপথ্যে মনে কী ক্রিয়াকল্প হয়, তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের লেখাপড়া ও ছবি আঁকায় মন কীভাবে ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কেও দুটো লেখা আছে। এছাড়া ভবিষ্যতের পেশা নির্ধারণ নিয়েও একটি প্রবন্ধ রাখা হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছবি ও ডায়াগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলো শিশু-কিশোরদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার লক্ষ্যে সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবন্ধের শিরোনামে সামান্য পরিমার্জনের পাশাপাশি বিষয়বস্তুতে সাম্প্রতিক সময়ে যে পরিবর্তন এসেছে তা সংযুক্ত করা হয়েছে।

মূলত শিশু-কিশোরদের মৌলিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই সিরিজ বা প্রবন্ধমালা প্রকাশ। শিশু-কিশোররা এতে যদি সামান্য উপকৃত হয় তাতেই এ আয়োজন সার্থক।

মানুষের মগজ

আশুতোষ গুহঠাকুরতা

মস্তিষ্ক ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রেইন তাকে সোজা বাংলায় বলা যায় মগজ। মগজের জোরেই মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এই মগজ বা মস্তিষ্কের শক্তিতেই মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধনায় অগ্রসর হয়েছে।

মস্তিষ্ক একটি অদ্ভুত জটিল জিনিস। ইন্দ্রিয় থেকে পাওয়া বিভিন্ন সংকেতের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে প্রতিনিয়ত নানারকমের অনুভূতি এখানেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। পেশি চালনা এবং বিভিন্ন পেশির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দ্বারা দেহের সবরকম সক্রিয়তার মূলও মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক আমাদের স্মৃতিশক্তির কেন্দ্র। অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি মস্তিষ্কের আছে বলে আমরা চিন্তাশক্তির অধিকারী হয়েছি। বস্তুত মন ও চিন্তাশক্তির অধিকারী হয়েছে বলে মানুষ জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে।

ক্ষুদ্র জীব পিপীলিকার অদ্ভুত সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কে আমাদের অনেক তথ্য জানা আছে। এদের দলসংগঠন, গৃহনির্মাণ, খাদ্যসংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজে শৃঙ্খলা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। মাত্র ২৫০টি স্নায়ুকোষ নিয়ে পিপীলিকার এই কর্মদক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের তুলনায় পিপীলিকার স্নায়ুতন্ত্র খুবই নগণ্য। মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের সংখ্যাই প্রায় ১০০০ কোটি, অর্থাৎ পৃথিবীর লোকসংখ্যার দুইগুণ। কাজেই স্নায়ুকোষ যেখানে এমন বিপুলভাবে জমা হয়েছে, সেখানে তার শক্তি ও সম্ভাবনা যে বিশাল হবেই। এতে আর আশ্চর্যের বিষয় কী আছে!

আমাদের গোটা মস্তিষ্ককে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— সম্মুখমস্তিষ্ক বা অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক এবং পশ্চাৎমস্তিষ্ক।

অগ্রমস্তিষ্ক : অগ্রমস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রধান অংশ গঠন করে। এটি তিন অংশে বিভক্ত। যথা—ক. সেরেব্রাম, খ. থ্যালামাস ও গ. হাইপোথ্যালামাস।

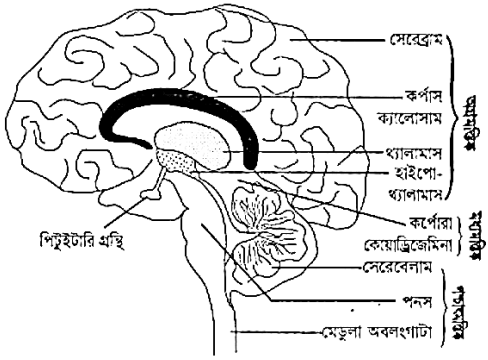

ছবি : মানবমস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

মনোবিজ্ঞানীদের কাছে ব্রেইন বা মগজ বা মস্তিষ্কের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি হলো অগ্রমস্তিষ্ক (Forebrain)। এটি তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : সেরেব্রাম, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস।

সেরেব্রাম—মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ (মস্তিষ্কের প্রায় ৮০% গঠন করে) এবং মস্তিষ্কের অন্য অংশকে ঢেকে রাখে। এটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। বাম সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার (Left cerebral hemisphere) এবং ডান সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার (Right cerebral hemisphere)। হেমিস্ফিয়ার দুটি পরস্পরের সঙ্গে কর্পাস ক্যালোসাম নামক স্নায়ুগুচ্ছ দ্বারা সংযুক্ত থাকে। প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার চারটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা—ফ্রন্টাল লোব, প্যারিয়েটাল লোব, অক্সিপিটাল লোব ও টেম্পোরাল লোব।

ফ্রন্টাল লোব (Frontal Lobes) : ফ্রন্টাল লোব আমাদের কপালের পেছনের মাথার খুলির অংশ থেকে মাথার মাঝখান পর্যন্ত প্রসারিত। এটি আমাদের চিন্তাভাবনায় মূল ভূমিকা পালন করে। এছাড়া মনে রাখা, সিদ্ধান্ত নেয়া, কথা বলা, ভবিষ্যতের পরিণাম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা, ক্রিয়াকলাপ, চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং সংবেদনগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

প্যারিয়েটাল লোব (Parietal Lobes) : মাথার ফ্রন্টাল লোবের ঠিক পেছনেই প্যারিয়েটাল লোব (Parietal Lobe) অবস্থিত। আমাদের

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন : হাত-পা কী করছে তা প্যারিয়েটাল লোব বুঝতে পারে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

টেম্পোরাল লোব (Temporal Lobes) : ফ্রন্টাল ও প্যারিয়েটাল লোবের নিচে মস্তিষ্কের গোড়ার মাঝে টেম্পোরাল লোব (Temporal Lobes) অবস্থিত। অর্থাৎ এটির অবস্থান কানের কাছে ও মাথার খুলির ভেতর। এটি কানের কাছে অবস্থিত হওয়ায় টেম্পোরাল লোব (Temporal Lobes) শ্রবণ বা শব্দ শোনার কাজের সঙ্গে জড়িত।

অক্সিপিটাল লোব (Occipital Lobes) : অক্সিপিটাল লোব মাথার পেছনের গোড়ায় অবস্থিত! এটি চোখের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে তা বিশ্লেষণ করে।

সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের নিচে দ্বিপ্রতিসম ক্ষুদ্র ও ডিম্বাকৃতির থ্যালামাস থাকে যা ধূসর পদার্থ দিয়ে গঠিত। এটি সংবেদী-উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং রিলে করে সেরেব্রামে পাঠায়। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলে ও পরিবেশ সম্পর্কে সতর্ক করে।

থ্যালামাসের ঠিক নিচে ধূসর পদার্থ দিয়ে হাইপোথ্যালামাস গঠিত। এটি অন্তত একডজন পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত থাকে। এটি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ, ভালো লাগা, ভীতি, আবেগ প্রভৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

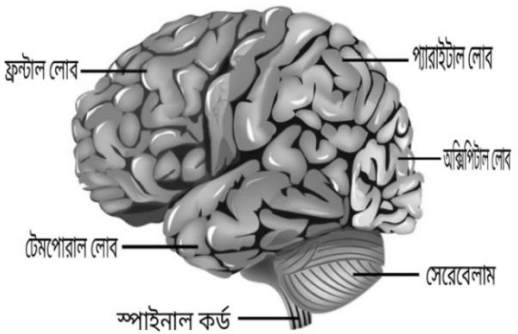

ছবি : মানবমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ

হাইপোথ্যালামাসের নিচে ছোট অংশটি মধ্যমস্তিষ্ক। উপরের দিকে দুটি গোলাকার খণ্ড এবং ভেতরের দিকে দুটি নলাকার ও পুরু স্নায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত। প্রথম দুটি সেরেব্রাল পেডাংকল এবং শেষের দুটি কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা। অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। দর্শন ও শ্রবণের রিফ্লেক্স কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। দেহের ভারসাম্য রক্ষা ও নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে।

পশ্চাৎমস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের পেছনের অংশ এবং তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা—সেরেবেলাম, মেডুলা অবলংগাটা এবং পনস। পশ্চাৎমস্তিষ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সেরেবেলাম যা সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের নিচে অবস্থিত। দুটি কুণ্ডলীকৃত সমগোলার্ধ নিয়ে গঠিত যারা ভার্নিস নামে একটি ক্ষুদ্র যোজকের সাহায্যে যুক্ত। এটি বাইরের দিকে কর্টেক্স এবং ভেতরের দিকে মেডুলা নিয়ে গঠিত। এটি দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। ঐচ্ছিক চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে। পেশির টান ও দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করে।

পনস ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যবর্তী অনেকটা ত্রিকোনাকার পুরু গঠনকে মেডুলা অবলংগাটা বলা হয়। এটি সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করে। এটি পৌষ্টিকনালির পেরিস্টালসিস, রক্তনালির সংকোচন, হৃদস্পন্দন, ফুসফুসের সংকোচন-প্রসারণ, লালাগ্রন্থির ক্ষরণ, মলমূত্র ত্যাগ, বমি ইত্যাদি শরীরবৃত্তীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।

সেরেবেলামের ভেতরের দিকে মেডুলার সামনের দিকে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি পিণ্ডাকার গঠনকে পনস বলে। এটি সেরেবেলাম ও মেডুলাকে মস্তিষ্কের অন্য অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে।

অগ্রমস্তিষ্ককে গুরুমস্তিষ্ক বলা হয়। গুরুমস্তিষ্কের বহিঃস্তর ধূসর পদার্থ দিয়ে গঠিত। এটি সাদা পদার্থ দিয়ে গঠিত একটি মজ্জাকে ঘিরে রেখেছে। বহিঃস্তরটিকে নব্যমস্তিষ্ক এবং অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট আদিমস্তিষ্ক—এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। মেরুদণ্ডী জীবের বিবর্তনের পর্যায়ে নব্যমস্তিষ্ক অংশের গঠন অনেক পরে আরম্ভ হয়েছে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। কর্টেক্সের অংশ বাদে বাকি অংশের গঠন অনেক পূর্বে আরম্ভ হয়েছে বলে ঐসব অংশকে প্রত্নমস্তিষ্ক বলা হয়। ১০ কোটি বছর পূর্বে ডাইনোসোরের যুগেই প্রত্নমস্তিষ্কের অংশ যথেষ্ট উন্নত স্তরে পৌঁছেছে।

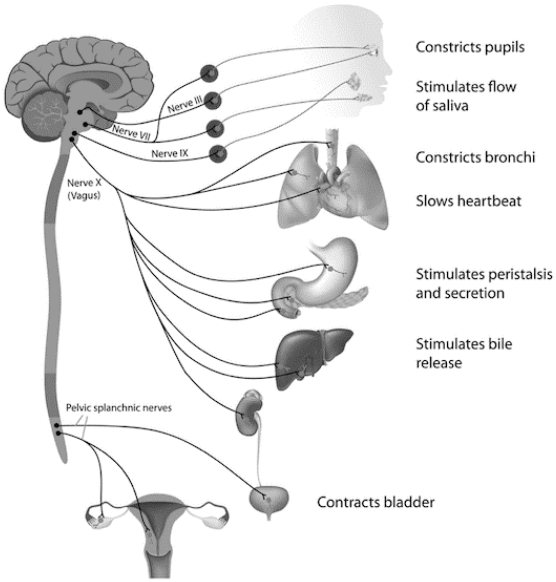

ছবি : মানবমস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুর মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে মাছ—এমনকি ব্যাঙ প্রভৃতি উভচর প্রাণীতে নব্যমস্তিষ্কের কোনো অস্তিত্ব নেই। সরীসৃপের পর্যায়ে এর সামান্য সূচনা দেখা যায়। সরীসৃপ হতেই পাখি ও স্তন্যপায়ী জীবের উদ্ভব হয়েছে। পাখির ক্ষেত্রে নব্যমস্তিষ্কের অংশ খুব উন্নত নয়। কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের ক্রমবিবর্তনের স্তরে স্তরে এই অংশের উন্নতি ঘটতে দেখা যায়। তবে বানরজাতীয় জীবের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত এর বৃদ্ধির গতি খুবই মন্থর ছিল। বানরের মস্তিষ্কে এই অংশের আয়তন হঠাৎ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবশেষে মানুষের মস্তিষ্কে এই অংশের অতিবৃদ্ধি ঘটেছে।

মধ্যমস্তিষ্ক ও পশ্চাৎমস্তিষ্ককে একসঙ্গে প্রত্নমস্তিষ্কও বলা হয়। আমাদের মস্তিষ্কের এই প্রাচীন অংশের সাহায্যে আমাদের জীবনধারণের মূল প্রয়োজনগুলো লাভ হয়। জীবন নির্বাহের জন্য খাবার সংগ্রহের প্রেরণা আমরা এই অংশ হতেই লাভ করি। শ্বাসক্রিয়া, হৃদস্পন্দন প্রভৃতি জীবনের ক্রিয়াগুলোও এই অংশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। নব্যমস্তিষ্কের তুলনায় আমাদের প্রত্নমস্তিষ্কের অংশটি খুবই ছোট। শুধু প্রত্নমস্তিষ্কই যদি

আমাদের সবকিছু হতো, তবে আমাদের মস্তিষ্কের আকার আরও অনেক ছোট হতো। এতটা ছোট যেন হাতের মুঠোয় রাখা যায়।

প্রত্নমস্তিষ্কের ওপরে গম্বুজের আকারে নব্যমস্তিষ্কের বিস্তৃতির ফলেই আমাদের মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। নব্যমস্তিষ্ক একটি বৃহৎ টিউমারের আকারে প্রত্নমস্তিষ্কের অংশটিকে আবৃত করে রেখেছে। নব্যমস্তিষ্কের মোট ওজন প্রায় দেড় কেজির মতো। অগণিত আণুবীক্ষণিক স্নায়ুকোষের দ্বারা এটি গঠিত। প্রত্যেক কোষ থেকে স্নায়ুসূত্র বের হয়ে পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে জটিল যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে এখানে এক গভীর জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে। সব ধরনের বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি এই অংশেই থাকে। এটা আমাদের চিন্তা ও মনের কেন্দ্র।

নব্য ও প্রাচীন মস্তিষ্ক পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল; কাজেই উভয় অংশই দেহের সবস্থানের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে একযোগে কাজ করে। দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাইরে থেকে আসা সংকেতগুলো এখানে গৃহীত হচ্ছে। প্রহরীর মতো ইন্দ্রিয়গুলো সংকেত প্রেরণ করে চলছে। স্নায়ুকেন্দ্রে এই সংকেতগুলো অবহেলিত হলে প্রতিমুহূর্তে আমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। কাজেই মস্তিষ্ককে ত্বরিতগতিতে এইসব সংকেতের অর্থ উদ্ধার করে উত্তর দিতে হচ্ছে। মস্তিষ্কের সাহায্য ছাড়া, এমনকি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা পর্যন্ত সম্ভব নয়। এখানে দেহের পেশি ও পেশিবন্ধনীগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে নানা সংকেত যাচাই হয়ে অসংখ্য স্নায়বিক যোগাযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলেই আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হয়।

এভাবে চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হতে প্রতিনিয়ত নানা সংকেতও মস্তিষ্ককে গ্রহণ ও যাচাই করতে হচ্ছে। কাজেই কেমন অদ্ভুত কর্মব্যস্ততা সেখানে ঘটে চলছে তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। মস্তিষ্কে বিভিন্নরূপ সংকেত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট আছে—যথা, মস্তিষ্কের পাশে কিছু স্থানে শুধু শ্রবণ ও স্পর্শন সম্পর্কিত সংকেতই গৃহীত হয়। এভাবে মস্তিষ্কের পেছন দিকের কিছু স্থান শুধু দর্শন সংশ্লিষ্ট সংকেত গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

দেহের অন্য অংশের সঙ্গে সুষুম্নাকাণ্ডের (মেরুরজ্জু বা Spinal cord) মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কাজেই ইন্দ্রিয় থেকে পাওয়া